প্রথম আলো অনলাইন সংস্করণ
বন্ধ করুন প্রিন্ট করুন

শনিবারের বিশেষ প্রতিবেদন

এবারও অদম্য মেধাবীদের জয়জয়কার

প্রথম আলো ডেস্ক

এবারের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় সারা দেশে জিপিএ-৫ পেয়েছে প্রায় সাড়ে ৫২ হাজার ছাত্রছাত্রী। এরা সবাই মেধাবী, সন্দেহ নেই। তবে এদের সবাই সমান সুযোগ-সুবিধা পায়নি। এদের মধ্যে এমন অনেকে আছে, যারা লেখাপড়ার সুযোগ দূরের কথা, তিন বেলা খাবারটুকুও পায়নি। দরিদ্র পরিবারের এসব ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার গল্প কঠিন সংগ্রামের মতো। সারা দেশের এ রকম অদম্য মেধাবীদের কয়েকজনের গল্প শোনাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধিরা:

অন্ধকারে পড়ার অদ্ভুত কৌশল রেজিয়ার: প্রায় প্রতি রাতেই কুপির তেল থাকত না রেজিয়াদের। অভাবের সংসারে তেল কেনার সংগতিও নেই। তাই বাবা-মা রেজিয়াকে পড়ালেখা বন্ধ করে সন্ধ্যা রাতেই ঘুমিয়ে পড়তে বলেন। অগত্যা রেজিয়া বেলা ডোবার আগেই সব পড়া শেষ করত। আর রাতে ভাঙা ঘরে শুয়ে অন্ধকারে সেই মুখস্থ পড়াগুলো বিড়বিড় করে আওড়াত। এ অবস্থা দেখে দরিদ্র ও নিরক্ষর বাবা-মা ধরে নেন, তাঁদের মেয়েকে 'জিনে ধরেছে'। এসএসসি পরীক্ষাটা হয়ে গেলে ওকে বিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেন তাঁরা। সেই রেজিয়া এবার এসএসসিতে বিজ্ঞান বিভাগে গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়েছে।

টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার এলেঙ্গা ইউনিয়নের হিন্নাইপাড়া গ্রামের দিনমজুর আবদুর রাজ্জাকের তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে রেজিয়া আক্তার বড়। পঞ্চম শ্রেণীতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পায়। পরে সে গ্রামের লোকজনের সহায়তায় মহেলা রাবেয়া সিরাজ উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে এবার এসএসসি পরীক্ষা দেয়। রেজিয়ার মেধা দেখে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাকে বিনা বেতনে পড়ান।

রেজিয়াদের বাড়ি গিয়ে দেখা যায়, ছোট্ট একটি ঘরে তিন ভাই বোন, বাবা-মা নিয়ে পাঁচ সদস্যের সংসার। সামান্য বৃষ্টিতেই চাল দিয়ে পানি পড়ে। গ্রামবাসী জানায়, রাজ্জাক দিনমজুরি করে যে টাকা পান তাতে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া দূরের কথা, তিন বেলা ঠিকমতো খেতেই পারেন না। রাতে কুপি জ্বালাবেন কোত্থেকে? লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ দেখে এসএসসির ফরম পূরণের পর পাশের বাড়ির লোকজন তাদের ঘরে একটি বৈদ্যুতিক বাতির সংযোগ দিয়েছিল।

রেজিয়ার মা আমেলা বেগম জানান, একদিকে সংসারের চরম অভাব, অন্যদিকে 'জিনে ধরেছে' মনে করে তাঁরা অষ্টম শ্রেণীতে ওঠার পরই রেজিয়ার বিয়ে ঠিক করেন। কিন্তু রেজিয়া তাতে রাজি হয়নি। ওর ইচ্ছা আরও লেখাপড়া করবে।

বাবা রাজ্জাক জানান, গ্রামের লোকজনের সহায়তা নিয়ে রেজিয়া লেখাপড়া করেছে। এখন কলেজে ভর্তি এবং উচ্চশিক্ষার খরচ কীভাবে জুটবে সেই দুশ্চিন্তায় আছেন।

রেজিয়া জানায়, তার স্বপ্ন ডাক্তার হওয়ার। কিন্তু বাবা-মায়ের সে সাধ্য নেই। ছোট ভাই বাবুল সপ্তম, আরেক বোন শিউলি চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ছে। তারাও রেজিয়ার মতো মেধাবী বলে গ্রামবাসী জানায়।

'হামার ছোলডা ফাস ডিবিসান পাচে': বৃদ্ধ ফজলুর রহমান প্রতিদিনের মতো গত ২৬ জুনও বাজারে গিয়েছিলেন দুধ বেচতে। এসএসসি পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে শুনে বাজারের পাশেই স্কুলে ছুটে যান ছেলে মাহবুবের খবর জানতে। শিক্ষকেরা তাঁকে একটি চিরকুটে লিখে দিলেন জিপিএ-৫। নিরক্ষর ফজলুর মাথায় যেন বাজ পড়ে–এটা আবার কী! শিক্ষকদের জিজ্ঞেস করেন, ছোলডা পাস করছে তো! শিক্ষকেরা তাঁকে আশ্বস্ত করেন, শুধু পাস নয়, মাহবুব খুব ভালো ফল করেছে। বৃদ্ধ ফজলুর মলিন মুখে তখন হাসি ফোটে। কিন্তু জিপিএ-৫ এর মর্ম আর তাঁর মাথায় ঢোকে না। উপজেলা সদরে গিয়ে তিনি এক আত্মীয়ের দোকানে চিরকুটটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'ছোলডা ফাস ডিবিসান পাচে কি না দ্যাখো তো।' ওই আত্মীয় তাঁকে বোঝান যে, তাঁর আকাঙ্ক্ষার চেয়ে অনেক বেশি ভালো করেছে মাহবুব।

ফজলুর রহমানের আনন্দ তখন দেখে কে! লুঙ্গির ভাঁজ থেকে দুধ বিক্রির ৪০ টাকা বের করে বিস্কুট কিনে সবাইকে খাইয়ে বাড়ির দিকে ছুট লাগান। পথে যাকেই পান, তাকেই চিরকুটটি দেখিয়ে বলেন, 'হামার ছোলডা ফাস ডিবিসান পাচে।'

ফজলুর রহমানের ছেলে মাহবুবুর রহমান এবার শিবগঞ্জ পাইলট উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল। বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে দুই কিলোমিটার দূরে তেঘরী গ্রামে মাহবুবদের বাড়ি। ছয় বোন, দুই ভাইয়ের মধ্যে মাহবুব সবার ছোট। পাঁচ বোনের বিয়ে হয়েছে। সংসারে সদস্য এখন পাঁচ। বয়স হয়ে যাওয়ায় ফজলুর রহমান আর পরিশ্রম করতে পারেন না। বাড়িতে গাভি পালন করে কোনো রকমে সংসার চালান। মাহবুবের বড় ভাই মানুষের বাড়িতে কামলা খাটেন। মাঝেমধ্যে মাহবুবও তাঁকে সহযোগিতা করে।

মাহবুবের স্কুলের শিক্ষক হাবিবুল আলম বলেন, 'মাহবুব অন্য রকম এক প্রতিভারধর ছেলে। কিন্তু তাদের পরিবারটা খুবই দরিদ্র। সুযোগ পেলে ছেলেটা ভবিষ্যতে অনেক বড় কিছু করে দেখাতে পারবে।' মাহবুবের ইচ্ছা, সে ডাক্তার হবে।

মাহবুবের মা আছিয়া বেগম বলেন, অনেক দিন গেছে তাঁদের চুলায় হাড়ি চড়ত না। মাহবুব না খেয়ে চুপচাপ স্কুলে চলে যেত। এ অবস্থায় তিনি অনেক দিন প্রতিবেশীদের কাছ থেকে দুমুঠো ভাত এনে খাইয়েছেন ছেলেকে।

মাহবুবের বাবা এখন পড়েছেন দুশ্চিন্তায়। তাঁর প্রশ্ন, 'যেটি হামরা দুই সাঁঝ প্যাট ভর্যা খাবার জোটাবার পারি ন্যা, সেটি ছোলডাক ডাকতোর বানামো ক্যাংকা কর্যা?'

বই-হারিকেন নিয়ে ভাইবোনে টানাটানি: এসএসসি পরীক্ষার কয়েক দিন আগের কথা। ইকরাম আলী বিশ্বাস রিকশাভ্যান নিয়ে বের হন উপার্জনের আশায়। মেয়ে রুপালী পরীক্ষার্থী। সে খাতা-কলম আর কাগজের জন্য বায়না ধরে। ইকরাম আলী সারা দিন ভ্যান চালিয়ে হিসাব করে দেখেন, চাল কিনলে খাতা-কলম-কাগজের টাকা আর থাকে না। অগত্যা ভ্যান নিয়ে বাজারেই থাকেন আরও কিছু আয়ের আশায়। দুপুরে কিছু মুখেও দেন না পাছে পকেটের টাকাটাও খরচ হয়ে যায়। এ রকম ঘটনা অনেক দিন ঘটেছে।

ইকরামের সেই কষ্ট আজ সার্থক হয়েছে। মেয়ে রুপালী খাতুন এবার মানবিক বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে। শুধু রুপালীই নয়, ওর বড় ভাই মাহিমও এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল একই সঙ্গে। মাহিমও একটুর জন্য জিপিএ-৫ পায়নি। সে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ-৪.৮৪ পেয়েছে।

ইকরামের বাড়ি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ফুরসন্ধী ইউনিয়নের মিয়াকুণ্ডু গ্রামে। ইকরাম জানান, তাঁর জমিজমা নেই। মাত্র তিন শতক জমির ওপর তাঁর বাড়িভিটে। মাটির একটি ঝুপড়ি ঘর দুই ভাই-বোনের জন্য মাঝখানে চাটাই দিয়ে আলাদা করে দিয়েছেন। সেখানেই তারা পড়ালেখা করে। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী বারান্দায় থাকেন।

রুপালীর মা জাহেদা খাতুন জানান, অনেক সময় তিনি পরের বাড়িতে কাজ করেছেন। কাঁথা সেলাই করে ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার খরচ জুগিয়েছেন। ওরা দুই ভাইবোন এক বই ভাগাভাগি করে পড়েছে। একটা হারিকেন নিয়ে চলত দুজনের টানাটানি।

সংসারের কষ্টের কথা বলতে গিয়ে রুপালীর চোখের পাতা ভিজে ওঠে। সে জানায়, তাদের দুই ভাইবোনকে পড়াতে গিয়ে মা-বাবাকে অনেক দিন না খেয়ে থাকতে হয়েছে। বড় ভাই মাহিমের জন্যও তার কষ্ট হয়। একটু প্রাইভেট পড়তে পারলে সেও জিপিএ-৫ পেত। মাহিম স্কুল পরিবর্তন করায় এক ক্লাস পিছিয়ে পড়ে। রুপালী মিয়াকুণ্ডু নিম্নমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও মাহিম নারিকেলবাড়িয়া জেড এ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেছে।

মাহিম জানায়, বোন রুপালী জিপিএ-৫ পাওয়ায় সে খুব খুশি। বোনের জন্য তার খুব মায়া হয়। শীতের মধ্যেও সে পাতলা জামা পরে স্কুলে যেত। তারও জোটেনি শীতের পোশাক। স্কুলের শিক্ষকেরা তাদের দুজনকেই খুব সহযোগিতা করেছেন।

'বাংলা পরীক্ষার দিন শুধু মুড়ি খেয়ে গেছি': ভূমিহীন দিনমজুর বাবা খগেন্দ্র রায় বয়সের ভারে ন্যুব্জ। কাজকর্ম করতে পারেন না। মা আরতি রানীও নানা রোগে আক্রান্ত। তাই সংসারের ভার জয়ন্তর ঘাড়ে। পরের বাড়ি কামলা দিয়ে সংসারে সহায়তা করার ফাঁকে ফাঁকে চলত তার লেখাপড়া। এভাবেই রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার ঘনিরামপুর বড়গোলা উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে জয়ন্ত।

উপজেলা সদর থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে কুর্শা ইউনিয়নের জয়বাংলা গ্রামে জয়ন্তদের বাড়ি। সেখানে গিয়ে দেখা যায়, একটা খুপরিঘর। ছোট্ট সেই ঘরের ভেতরে একটা ভাঙা চৌকি পাতা। নেই কোনো চেয়ার, টেবিল। ভাঙা চৌকিতে উপুড় হয়ে বসে লেখাপড়া করে জয়ন্ত। আর বাবা-মা ঘুমান মাটিতে বিছানা পেতে।

জয়ন্ত বলে, 'অনেক রাত গেছে যখন কুপির তেল কেনার টাকাও থাকত না। সেদিন পড়া বাদ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। বাংলা পরীক্ষার দিন শুধু মুড়ি খেয়ে পরীক্ষা দিতে গেছি'–বলেই কেঁদে ফেলে জয়ন্ত। জয়ন্ত আরও বলে, 'স্কুলের শিক্ষকেরা আমাকে খুব সহযোগিতা করেছেন। তাঁরা বিনা বেতনে পড়িয়েছেন। প্রধান শিক্ষক মাঝেমধ্যেই বই, খাতা, কলম কিনে দিয়েছেন। তাঁদের সহযোগিতার কারণেই আমি ভালো ফল করতে পেরেছি।'

গ্রামের আকমাল, সাইদুল, জাভেদসহ অন্যরাও জয়ন্তর সাফল্যে খুব খুশি। তাঁরা জানান, চুক্তিতে কাজ নিয়ে ভোর পাঁচটা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত জয়ন্ত ওই কাজ করে স্কুলে যেত। আবার বিকেলে বাড়ি ফিরে চুক্তির কাজ শেষ করত।

মা আরতি জানান, জয়ন্তর ভালো কাপড় বলতে একটা দেড় শ টাকার শার্ট আর ২০০ টাকার প্যান্ট। পরীক্ষার আগে এক প্রতিবেশী ওই পোশাক দুটি দিয়েছিলেন। বাবা খগেন্দ্র বলেন, 'আমার ইচ্ছা জয়ন্ত আরও পড়ুক। কিন্তু ওই খরচ জোগানোর সামর্থ্য তো আমার নাই।'

শিক্ষক আলিফ লায়লা, ভরত রায়, ব্রজেন্দ্র নাথ, জলিলুর রহমান, আজম আলী জানান, জয়ন্ত তাঁদের স্কুলে সত্যিকারের আলো জ্বালিয়েছে। সে দেখিয়ে দিয়েছে, অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করে কীভাবে জয়ী হতে হয়। প্রধান শিক্ষক আলিয়ার রহমান বলেন, 'আমি জানতাম ছেলেটা ভালো ফল করবে। কিন্তু এত ভালো করবে, তা কল্পনাও করতে পারিনি। আমি দেশের সবার কাছে ছেলেটার পাশে দাঁড়ানোর আবেদন জানাই।'

প্রতিবন্ধিতাও রুখতে পারেনি শিউলিকে: প্রথম শ্রেণীতে পড়ার সময় পোলিওতে আক্রান্ত হয়ে শিউলির স্বাভাবিক চলাফেরার ক্ষমতা চলে যায়। সবাই ভেবেছিল, মেয়েটির আর বুঝি পড়ালেখা হবে না। কিন্তু ওর মনে ছিল প্রচণ্ড জেদ। তাই রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মেয়েটা বাড়ি থেকে এক মাইল দূরের স্কুলে নিয়মিত ক্লাস করে এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় বাণিজ্য বিভাগ থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে। ওর পুরো নাম সুরাইয়া হুদা শিউলি। যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার আকিজ কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রী সে।

ওই উপজেলার বাদে নাভারণ গ্রামে শিউলিদের বাড়ি। তার বাবা আবদুর রাজ্জাক বছর তিনেক আগে মারা গেছেন। সম্বল বলতে ভিটের মাটি ও তার ওপর টিনের ছাউনি দেওয়া মাটির দেয়ালের একটি ঘর ছাড়া আর কিছুই নেই।

শিউলির মা লতিফুন্নেসা জানান, ওর বাবার সঙ্গে বিড়ির কারখানায় কাজ করে আর কিছু গরু-ছাগল পালন করে কোনো রকমে সংসার চলত। কিন্তু তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর একার রোজগারে মেয়ে শিউলি ও ছেলে মইনুরের লেখাপড়া আর সংসারের খরচ চালাতে তিনি এখন হিমশিম খাচ্ছেন। কোনো দিন খেয়ে, কোনো দিন না খেয়ে তাঁদের দিন পার হয়।

শিউলি জানায়, স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক নাজনীন ম্যাডাম তাকে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ করে দেন। তিনিই তার বইপত্র, জামাকাপড় সবকিছু দিয়ে আসছেন। এভাবে সে অষ্টম শ্রেণীতে বৃত্তি পায়। স্কুলের রবিন স্যার ও মেহেদী স্যারের সহযোগিতার কথাও শিউলি উল্লেখ করে।

স্কুলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মুজিবুর রহমান জানান, শিউলি খুবই মেধাবী মেয়ে। দারিদ্র্যের পাশাপাশি প্রতিবন্ধিতার সঙ্গেও লড়েছে সে। স্কুলের পক্ষ থেকে তাকে সব ধরনের সহযোগিতা করা হয়েছে। তাকে কলেজেও সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে।

চলনবিলে মাঝিগিরি করেছে নাজমুল: 'রাতে পড়তে পড়তে বাতির তেল ফুরিয়ে যেত, তখন বাধ্য হয়ে লেখাপড়া বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়তাম। পরদিন নৌকা চালিয়ে উপার্জিত সামান্য টাকায় আবার তেল কিনতাম। বছরের পাঁচ মাস চলনবিলে এভাবে নৌকা চালিয়ে পড়ালেখা করেছি। গ্রামের পাশে বেহুলার খালেও নৌকায় লোকজন পারাপার করেছি। সকালে ঘুম থেকে উঠেই খালে ছুটতাম এবং সেখান থেকে স্কুলে যেতাম। এভাবে অনেক দিনই স্কুল বাদ পড়ত। কিন্তু স্যারেরা আমাদের সংসারের কথা জানতেন বলে কিছু বলতেন না।' কথাগুলো বলে সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলার খড়খড়িয়া গ্রামের দিনমজুর জসিম উদ্দীনের ছেলে নাজমুল। সে এবার লালুয়া মাঝিরা উচ্চবিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে পরীক্ষা দিয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে।

এলাকাবাসী জানায়, নাজমুল দশম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাসে কোনো দিনই প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হয়নি। প্রাথমিক ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পায় সে। তিন ভাই, দুই বোনের মধ্যে সে বড়। মাঝিগিরির পাশাপাশি টিউশনি ও দিনমজুরি করেও সে পড়ার খরচ জোগাড় করেছে।

নাজমুল জানায়, সংসারে অভাবের কারণে ছোট ভাই এনামুলের লেখাপড়া হয়নি। সে এখন নাটোরের একটি চায়ের দোকানে কাজ করে। বোন জবা মানুষের বাড়ি সকালে থালাবাসন মাজার কাজ করে, তারপর স্কুলে যায়। এখন সে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ছে। ছোট ভাই এবাদতের বয়স এক-দেড় বছর।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আসাদুজ্জামান ও বিজ্ঞান শিক্ষক স্বপন কুমার বলেন, 'নাজমুলের উপস্থিত বুদ্ধি, সুন্দর উপস্থাপনা, কৌতুক বানানো ও তা উপস্থাপনের অনন্য গুণ রয়েছে। তার সংগ্রামের কথা আমরা জানতাম। তাই স্কুলের সব ধরনের বেতন তার জন্য মওকুফ করা হয়েছিল।' ইংরেজির শিক্ষক মো. জহুরুল ইসলাম বলেন, নাজমুল যেভাবে প্রতিদিন অল্প সময় লেখাপড়া করেই ভালো ফল করেছে, তাতে অনেকেই বিস্মিত। পৃষ্ঠপোষকতা পেলে ভবিষ্যতে সে আরও ভালো করবে।

[এই প্রতিবেদনের জন্য তথ্য সরবরাহ করেছেন আমাদের টাঙ্গাইল প্রতিনিধি কামনাশীষ শেখর, শিবগঞ্জ (বগুড়া) প্রতিনিধি জামিল আহমেদ পরাগ, ঝিনাইদহের নিজস্ব প্রতিবেদক আজাদ রহমান, তারাগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি রহিদুল মিয়া, যশোরের নিজস্ব প্রতিবেদক অশোক সেন ও সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি এনামুল হক খোকন।]

URL : http://www.prothom-alo.com/archive/print.php?dt=&issue_id=&t=h&nid=MTcyMDg=

বন্ধ করুন | প্রিন্ট করুন

Home | **About Us** | **Feedback** | **Contact**

Best viewed at 1024 x 768 pixels and IE 5.5 & 6

Editor : Matiur Rahman, Published by : Mahfuz Anam, 52 Motijheel C/A , Dhaka-1000.
News, Editorial and Commercial Office: CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue, Karwan Bazar, Dhaka-1215.
Phone: (PABX) 8802-8110081, 8802-8115307-10, Fax: 8802-9130496, E-mail : info@prothom-alo.com

Concept & Design by **Prothom-Alo.com**
Copyright 2005, All rights reserved by Prothom-Alo.com